গণমাধ্যমে আইসিটি : সাম্প্রতিক ভূমিকা

আবীর হাসান

তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির পথ ধরেই বা আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, আইসিটিকে নির্ভর করে আধুনিক গণমাধ্যমের (তা সে পত্রপত্রিকাই হোক কিংবা টেলিভিশনই হোক) এত সমুজ্জ্বল উপস্থিতি। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা কিংবা টেলিভিশন যেভাবে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হয়, তাতে করে দেশটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রকৃত চিত্রটি বোঝার উপায় নেই। বেশিরভাগ দৈনিক পত্রিকাই প্রায় প্রতিদিন প্রধান শিরোনাম করে বড় বড় লাল রঙের অক্ষর দিয়ে। এছাড়া সাজসজ্জাতেও দেখা যাচ্ছে বর্ণিল নতুনত্ব। টেলিভিশনগুলো আকর্ষণীয় ঝকঝকে স্ক্রিন, অভিনব গ্রাফিক্স দিয়ে সম্প্রচার চালায় দেশে-বিদেশে। তার ওপর এ জৌলুস দেখে বোঝার উপায় নেই দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে কতজন কিংবা দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে মধ্যবিত্ত কী ধরনের সঙ্কটে আছে। অথবা শিক্ষা-জ্ঞান-সংস্কৃতির কোনো সঙ্কট আছে কি না। গণমাধ্যমের এই সর্বপ-খী বাহারি উপস্থাপনার পেছনে কিন্তু আছে প্রযুক্তির বিরাট অবদান; বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির। এই প্রযুক্তির উন্নতি যত ঘটছে ততই দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের গণমাধ্যমও বর্ণে-কৌশলে আধুনিক হয়ে উঠছে।

আসলে বাংলাদেশে কমপিউটার এবং সংশি-ষ্ট প্রযুক্তির ব্যবহার সফলভাবে শুরু করেছিল পত্রপত্রিকাগুলোই। কমপিউটারে বাংলা ব্যবহারও ব্যাপকভাবে করে সংবাদপত্রই। গত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম দিক থেকেই প্রকাশনা শিল্পের মাধ্যমে কমপিউটারনির্ভর ডেস্কটপ পাবলিকেশনের ব্যাপক প্রসার হয়। সে সময়ে না হলেও বছর পাঁচেক পর থেকে পত্রপত্রিকাগুলোয় আইসিটি বিষয়টিই অন্যতম একটি প্রকাশনার অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। আইসিটিবিষয়ক তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে শুরু করে নতুন প্রযুক্তি, সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়গুলো ক্রমাগত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। এর ফল ছিল বহুমাত্রিক। একদিকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে আইসিটির যে বাণিজ্যিক পরিমণ্ডল সেটাও বিস্তৃত হতে থাকে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকাশনাও বাড়তে থাকে।

এ অবস্থাটা চলেছিল বছর সাতেক। কিন্তু যে সময়ে আরও জোরেশোরে অনেক কিছু লেখা, অনেক কিছু জানানোর প্রয়োজন ছিল, সে সময়ই আকস্মিকভাবে সীমিত হয়ে যায় প্রকাশনা। এই কারণটা কি কেউ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন? এটা সম্ভবত ২০০৪ সালের শেষ দিকে ঘটেছিল। আকস্মিকভাবেই তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিবিষয়ক প্রকাশনা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে থাকল দৈনিক পত্রিকাগুলো। এমন নয় যে তখন তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক গবেষণা, প্রযুক্তি, উন্নয়ন এসব কমে গিয়েছিল কিংবা হঠাৎ করে লেখকের অভাব পড়ে গিয়েছিল। দেখা গেল গুটিকয়েক পত্রিকায় আইসিটি চর্চার বিষয়টা চালু থাকল, দুয়েকটি পত্রিকা সাপ্তাহিক একটি পাতা চালু রাখল; কিন্তু বেশিরভাগ পত্রিকাই ব্যাপারটা ঝেরে ফেলেছিল।

সম্ভবত সে সময় কিছুটা মূল্যস্ফীতি ঘটেছিল দেশে। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতাও চলছিল। সে সময় অনেক পত্রিকাই সম্পাদকীয় নীতিতে যে পরিবর্তন আনে তার প্রধান বিশেষত্বই ছিল আইসিটি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানবিষয়ক পাতাগুলো ছেঁটে ফেলে কৃচ্ছ্রসাধন করা। তবে এটাও বলে রাখা ভালো, গুটিকয়েক পত্রিকা এ কাজটি করেনি। তারাই কিন্তু এখন পর্যন্ত এগিয়ে আছে (সার্কুলেশন বা বাণিজ্যিক দুভাবেই)। যারা কৃচ্ছ্রসাধন করতে গিয়েছিল তারা পাঠকপ্রিয়তাও হারিয়েছে, বাণিজ্যিক সাফল্যও ধরে রাখতে পারেনি।

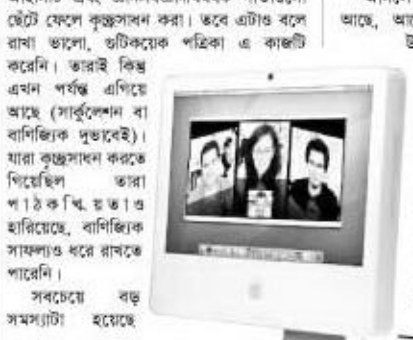

সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হয়েছে পাঠক-বিশেষত নতুন প্রজন্মের। তারা আশাহত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আইসিটিবিষয়ক যে লেখালেখির একটি বর্ণিল জগৎ পত্রপত্রিকাগুলো তৈরি করেছিল সেগুলোর পথ ধরে একে একে খুলে যেতে শুরু করেছিল জ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রগুলোও। বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের খবর, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় তারুণ্যকে তো বটেই সাধারণ পাঠককেও দারুণ আলোড়িত করেছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় জিনোম সিকোয়েন্সিং, ন্যানো টেকনোলজি রোবটিক্স, টপ কোয়ার্ক গবেষণার কথা। এছাড়া মহাকাশ বিজ্ঞান, ওশেনোগ্রাফি, পরিবেশ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলোও যুক্ত হয়েছিল। ফলে সত্যিকার অর্থেই সংবাদপত্রগুলো মানুষকে সচেতন ও শিক্ষিত করে তুলছিল। কিন্তু আকস্মিকভাবেই দেখা গেল ওসবের পাঠ চুকিয়ে ফেলতে। পাঠকসমাজের জ্ঞানলিপ্সার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে দেখা গেল বিনোদন, বিদ্রূপ আর রাজনীতিকে বেশি জায়গা দিতে। একে কী বলা যায়? একবিংশ শতাব্দীতে সম্পাদকীয় নীতির স্খলন বা ব্যর্থতা! এভাবে দেখা ছাড়া উপায় নেই। কারণ যারা ব্যর্থ হননি, তাদেরকে দেখা যাচ্ছে আগেকার সম্পাদকীয় নীতি বজায় রেখে চলতে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়- সাত-আট বছরে পাঠক অনেকটাই সচেতন ও শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল, তাদের জ্ঞানস্পৃহা কমেনি। ফলে যেখানে ন্যূনতম জ্ঞানের বিষয়গুলো পাওয়ার সম্ভাবনা দেখেছে তারা সেখানেই তাদের জায়গা করে নিয়েছে। অর্থাৎ পাঠকসংখ্যা বেড়েছে ওই পত্রিকাগুলোরই যারা আইসিটি ও বিজ্ঞানবিষয়ক তথ্য দেয়ার কাজটা চালিয়ে গেছে।

আসলে বিশ্বব্যাপীই নানা রকম সমস্যা আছে, আছে অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক উত্থান-পতনও, কিন্তু সেসবের মধ্যে দেখা যাচ্ছে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের গণমাধ্যম আইসিটি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য মানুষকে দিয়ে চলেছে। এর কারণ হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীতে অনেক কিছু বদলানোর সাথে সাথে সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতিতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের বিষয়টা আমাদের দেশে সম্ভবত গণমাধ্যম সম্পর্কিত দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের বেশিরভাগই ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারেননি। ফলে আধুনিক কী বিষয় নিয়ে তারা প্রতিযোগিতায় নামবেন তা বুঝতে পারেননি। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার বিষয়টিকে অনেকেই নিছক স্লোগান মনে করেছেন কিংবা ভেবেছেন ওটা এমনি এমনি হয়ে যাবে। এ বিষয়টি যে অনেকাংশেই গণমাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল সেটা বুঝতে পারেননি। ফলে আপাতদৃষ্টিতে জনপ্রিয় রাজনীতি আর বিনোদনকেই আঁকড়ে ধরে চাওয়া হয়েছে জনপ্রিয়তা। কিন্তু পাঠককে অবোধ বা বোকা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। কারণ তারা আঁচ করতে পারেন কোথাও না কোথাও কিছু ঘটে চলেছে; কিন্তু তার প্রকৃত রূপটা তারা জানতে পারছেন না। যদিও আমাদের দেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখনও তুলনামূলকভাবে অনেক কম; কিন্তু তবুও তথ্য গোপন থাকে না। দেরিতে হলেও অথবা সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও সাধারণ মানুষ ঠিকই জেনে যায়।

প্রকৃতপক্ষে আইসিটির সঙ্গে গণমাধ্যমের একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আইসিটির উষালগ্ন থেকে। পশ্চিমা বিশ্বেই এর উন্মেষ এবং এখন পর্যন্ত পশ্চিমা গণমাধ্যম তাদের

(বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়)

গণমাধ্যমে আইসিটি

(৫৭ পৃষ্ঠার পর)

সম্পাদকীয় নীতিতে পরিবর্তন এনে এ-বিষয়ক দায়িত্ব পালন করে চলেছে। একবিংশ শতাব্দীর এক অনন্য বাস্তবতা যে আইসিটি সেটা পশ্চিমবিশ্ব কেবল নয়, অনেক এশীয় উন্নয়নশীল দেশও উপলব্ধি করেছে, ফলে তাদের গণমাধ্যম কাজটা করছে। আমরাও কিন্তু এ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভালোভাবেই শুরু করেছিলাম; কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে সেই ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি।

সাম্প্রতিক একটি প্রসঙ্গ টেনে এ লেখার সমাপ্তি টানতে চাই। বিষয়টি হচ্ছে গত ২৬ এপ্রিল বিশ্বব্যাপী পালিত হয়েছে বিশ্ব মেধাস্বত্ব আইন দিবস। এ দেশেও খুবই সীমিত আকারে পালন করেছেন আইসিটিসংশি-ষ্ট ব্যক্তিরা। অথচ এ বিষয়ে এ সময়ে সবচেয়ে সোচ্চার হওয়ার কথা ছিল মেধাস্বত্বের মূল ধারক গণমাধ্যমগুলোর। আমাদের সংবাদপত্র, টেলিভিশন সব সময়ই মেধাস্বত্ব বিষয়ক নানান সমস্যায় ভোগে এবং মাঝেমাঝেই দেখা যায় নিজেদের স্বার্থে যখন আঘাত লাগে তখন খানিকটা সোচ্চার হতে। কিন্তু মেধাস্বত্বের বিষয়টি যে জনসাধারণকে জানানো প্রয়োজন, এ বিষয়ে নীতিমালা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ যে হওয়া দরকার সে বিষয়টি কেউ তুলে ধরেন না। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমগুলোর আগ্রহ এ বিষয়টিতে বেশি থাকার কথা। কারণ, তারা নতুন নতুন বহু বিষয় প্রকাশ করে, যার স্বত্ব সঠিকভাবে বজায় না রাখা হলে স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে সময়মতো এরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারে না। আইসিটিভিত্তিক কাজ করেও আইসিটিবিমুখতাই এর কারণ। এই স্ববিরোধী ভূমিকা থেকে গণমাধ্যমকে বেরিয়ে আসতে হবে। তা না হলে এক সময় অস্তিত্বের সঙ্কটও দেখা দিতে পারে।

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com